গণমাধ্যমে মার্কিন ভিসানীতি: রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপর মার্কিন ভিসানীতি প্রয়োগের পর সাংবাদিক নেতাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এটিকে গণমাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপও বলছেন তারা। একই সাথে পিটার হাসের বক্তব্য প্রত্যাহারেরও দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা। যদিও ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের ঘোষণার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য হুমকি বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, “স্বাধীন দেশের গণমাধ্যমের ওপর নিষেজ্ঞার আরোপের কথা পিটার হাস এভাবে বলতে পারেন না। কার বাংলাদেশ স্বাধীন স্বার্বভৌম দেশ। ভিসা নীতি আরোপ করলে সাংবাদিক সমাজে অস্বস্তি সৃষ্টি হবে। যেসব সাংবাদিকদের সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করে তারা মত প্রকাশে দ্বিধান্বিত বোধ করবেন।”

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম বলেন, “গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করে কী গণতন্ত্র নিশ্চিত করা আদৌ সম্ভব? বাংলাদেশের ইতিহাসে খারাপ নজির সৃষ্টি করেছেন পিটার হাস। গণমাধ্যম পরোক্ষভাবে চাপ প্রয়োগ করেছেন তিনি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিরোধীতাকারীরা যখন গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বাধীন দেশের গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে যা খুবই দুঃখজনক।”

ঢাকা ডিপ্লোমেট ডট কম এবং সংবাদ সারাবেলার সম্পদক আব্দুল মজিদ বলেন, “সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে যাদের ভুমিকা রয়েছে, যেমন আইন শৃঙখলা ররক্ষাকারী বাহিনী, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি দল ও বিরোধী দল এবং গণমাধ্যম, ভিসানীতির নামে তাদেরকেই হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমত, একটি স্বাধীন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া নিয়ে অযাচিত কথা বলে এক ধরনের হস্তক্ষেপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যা অগ্রহণযোগ্য। ভিসানীতি কার্যকরের ঘোষণায় মূলত তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবে না।”

সিলেটের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও দৈনিক উত্তরপূর্ব পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক তাপস দাশ পুরকায়স্থ বলেন, “কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করবে ওয়াশিংটন। নিষেধাজ্ঞায় না থাকা বিষয় নিয়ে মন্তব্য করা কূটনীতিক সৃষ্টাচার বর্হিভূত কাজ। আর গণমাধ্যমকে ভিসানীতির আওতায় আনলে গণতন্ত্র বিকশিত নয়, নিয়ন্ত্রিত হবে।”

গত ২৪ সেপ্টেম্বর একটি বেসরকারি চ্যানেলের কার্যালয়ে এসে সাক্ষাৎকারে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, সরকারি দল, বিরোধী দল ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পর আগামীতে গণমাধ্যমও ভিসানীতিতে যুক্ত হবে।

কক্সবাজার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সমীক্ষা প্রকল্পের পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নিয়োগের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক) ও কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসাল্টেন্ট (সিএসসি) এর মধ্যে “কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়েছে। এই প্রকল্পে কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসাল্টেন্ট (সিএসসি) এর সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে সেলট্রন ইএমএস এবং এহসান খান আর্কিটেক্টস।

মঙ্গলবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কউক-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর মোহাম্মাদ নুরুল আবছার, এনজিপি এনডিসি, পিএসসি, বিএন (অব.), লে. কর্নেল মো. খিজির খান পি ইঞ্জ, সদস্য (প্রকৌশল) লে. কর্নেল তাহসিন বিন আলম, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স এবং উপ নগর পরিকল্পনাবিদ ও “কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. তানভীর হাসান রেজাউল।

এছাড়া সিএসসি-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সিএসসি-এর ডিরেক্টর (প্ল্যানিং এন্ড কনস্ট্রাকশন) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহ-আল-মামুন ও “কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক লে. কর্নেল সাদেক মাহমুদ।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পটির আওতায় কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলা (চকরিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ) এবং সমুদ্র সৈকত এলাকাসহ মোট ৬৯০.৬৭ বর্গ কি.মি. এলাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান এবং কক্সবাজার জেলার ২৪৯১.৮৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জন্য স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া টেকসই যাতায়াত ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পাহাড়, বন, জলাশয় ও সমুদ্র অঞ্চল সংরক্ষণ, সমুদ্র সৈকতের নির্দিষ্ট সীমানা সংরক্ষণ, অবৈধ ও অপরিকল্পিত স্থাপনা অপসারণ, জল ও স্থলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দূষণ প্রতিরোধ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সুবিধা নিশ্চিতকরণ, আবাসন ব্যবস্থা বিষয়ক পরিকল্পনা, সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্যবর্ধন ও ভূমিক্ষয় রোধকরণ করা হবে।

প্রকল্পটি ২০২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর মোট ১৭৪.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন দেয়। গত ১২ জানুয়ারি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মেয়াদকাল এপ্রিল ২০২১ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।

মেহেরপুরে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সংবাদ সম্মেলন

দীর্ঘদিন ধরে নানা বঞ্চনা ও বৈষম্যের অভিযোগ তুলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় এবার কর্মবিরতিতে যাওয়ার

ঘোষণা দিয়েছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতারা।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরেও সংবাদ সম্মেলন করে তাদের দাবি ও পরবর্তী কর্মসূচীর ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু বলেন, প্রধানমন্ত্রী সকল ক্যাডারের জন্য সুপার নিউমারি পদে পদোন্নতি দিয়ে ক্যাডার বৈষম্য নিরসনের নির্দেশনা দিলেও তা পালিত হয়নি, আন্ত ক্যাডার বৈষম্য নিরসনের নির্দেশনা বারবার দেওয়া হলেও সে নির্দেশনা মানা হচ্ছে না। শিক্ষা ক্যাডারের গ্রেড উন্নয়নের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাও কার্যকর করা হয়নি।

তিনি দাবী জানিয়ে বলেন, শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকালকে নন ভেকেশন সার্ভিস ঘোষণা কেও পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষা ক্যাডার নিয়ন্ত্রিত জেলা ও উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিনি বলেন, এসকল দাবী নিয়ে কেন্দ্রীয় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নির্দেশনা অনুযায়ী ২ অক্টোবর সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরেও এক দিনের কর্মবিরতি পালন করবেন তারা। এই কর্ম বিরতি শুধুমাত্র সরকারি কলেজগুলোতে পালন করা হবে। এরপরও দাবি পূরণে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হলে আগামী ১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর টানা তিন দিনের কর্মবিরতি পালন করা হবে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুর নেতৃত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শফিউল ইসলাম সরদার, সহযোগী অধ্যাপক ও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মেহেরপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক খেজমত আলী মালিথা, সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, সরকারী অধ্যাপক মইনুল ইসলাম, সিরাজ উদ্দিন, নজির আহমেদ সিদ্দিকী সহ শিক্ষক নেতারা।

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা কোন দেশকেই দমাতে পারেনি, বাংলাদেশকে পারবে?

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর গত সাড়ে তিন দশক ধরে পৃথিবীতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরাক থেকে শুরু করে সিরিয়া, হালের ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধেও বাতাস দিচ্ছে তারা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই থাবা থেকে বাদ যায়নি আফ্রিকার দেশগুলোও। যখন যেখানে নিজেদের স্বার্থের বিষয় এসেছে, সেখানেই যুক্তরাষ্ট্র নানান কৌশল আর ছলচাতুরি আশ্রয়ে হস্তক্ষেপ করেছে। জারি করেছে নানা ধরণের স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞা।

সম্প্রতি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের তিন মাস আগে জারি করলো ভিসা নীতি। বিশ্বের বেশিরভাগ রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন, এটা তারা করেছে নিজেদের স্বার্থে এবং ভূ-রাজনৈতিক কারণে। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সরাসরি হস্তেক্ষেপ করলো। গণতন্ত্র, মানবাধিকার রক্ষা আর সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক ভোটের অজুহাত দিয়ে, বাংলাদেশের উপর ছড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করলো যুক্তরাষ্ট্র। এর পেছনের গল্প হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন ভাল নয়। তাই তাদের লক্ষ্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল করা।

বিশ্লেষকরা আরও বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের শেষ দু’টি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগ উঠছে। এখন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নানাভাবে ঘায়েল করছে তৎপর বাইডেন প্রশাসন। নিজেদের দেশের এসব অগণতান্ত্রিক আচরণ নিয়ে মাথা না ঘামাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র। উল্টো নিজের মোড়লিপনা জাহির করে সেসব অপকর্ম ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করছে।

একটু পিছনের দিকে গেলে দেখা যায়, আজকে যে স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞার সংস্কৃতি চালু হয়েছে, এর শুরু হয়েছিল নব্বই এর দশকে এই

যুক্তরাষ্ট্রের হাত ধরেই। বিশ্ব জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই ‘স্যাংশন পলিটিক্স’ এখন ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক জর্জ লোপেজ যুক্তরাষ্ট্রের এই স্যাংশন পলিটিক্সকে নব্বইয়ের দশককে ‘স্যাংশন ডিকেডস’ হিসেবে চিহ্নিত করেন। বিশ্লেষকদের দাবি, মানবাধিকার বা গণতন্ত্রের কথা বলে স্যাংশন দেয়া হলেও বেশিরভাগ সময় ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থসহ অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

যুক্তরাষ্ট্রে পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের স্কুল অফ সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজের অধ্যাপক সায়ীদ ইফতেখার আহমেদ মনে করেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন’ এর ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বললেও অনেক দেশ, যারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে তাদের ব্যাপারে চুপ থাকে। যেমন ‘সৌদি আরব’। সেখানে মানবাধিকার বা গণতন্ত্র না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র কখনই তাদের নিষেধাজ্ঞা দেয় নি।

একইভাবে যদি আমরা পাকিস্তানের দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে দেশটি সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, উগ্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সেনা হস্তক্ষেপে বিপর্যস্ত। সেখানেও দীর্ঘদিন গণতন্ত্র নেই। তারপরেও পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দেয় না। উল্টো আমেরিকার গণতন্ত্র সামিটে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ পাঠায়।

এখন আমরা নির্দিধায় বলতে পারি, আমেরিকা নিজেদের স্বার্থ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য স্যাংশন দিচ্ছে। এক্ষেত্রে কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন, কোথাও গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র, আবার কোথাও সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ৯ হাজার ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং কিছু খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ওই বছরই বাইডেন প্রশাসন বিশ্বব্যাপী আরও ৭৬৫টি নতুন নিষেধাজ্ঞা দেয়। এরমধ্যে ১৭৩টি ছিল মানবাধিকার ইস্যুতে।

যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় পড়েছে, বৈশ্বিক উৎপাদনে সেই দেশগুলোর অবদান প্রায় এক–পঞ্চমাংশ। এই উৎপাদনের ৮০ ভাগ দাবিদার চীন। কোনো নিষেধাজ্ঞা দিয়েই চীনকে দমাতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ চীনের উপর যতো নিষেধাজ্ঞা দেয়া হোক সেগুলো কোন কাজে আসছে না।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত এক হাজার ৯৪৮টি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পথ ধরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ড ও কানাডা। এপর্যন্ত তারা যথাক্রমে এক হাজার ৭৮২টি এবং এক হাজার ৫৯০টি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। কিন্তু রাশিয়া অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হওয়ায় এই নিষেধাজ্ঞা তেমন কোন প্রভাব ফেলেনি। বরং তাদের অর্থনীতি অনেক বেশি টেকসই ও মজবুত হয়েছে।

মজার বিষয় হচ্ছে, রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা দিলেও সেগুলো শতভাগ কার্যকর করতে পারেনি নিষেধাজ্ঞা দেয়া দেশগুলো। যেসব পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সেগুলো কোনো না কোনোভাবে রাশিয়ায় যাচ্ছে এবং ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা যারা কার্যকর করবে সেই ইউরোপ নিজেদের স্বার্থে সেটা করছে না। তারা কোনোভাবেই নিজেদের ব্যবসা নষ্ট করতে চাইছে না।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১২টি দেশ, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০২২ সালে এসব দেশ রাশিয়ায় কাছে সাড়ে ৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিক্রি করেছে। যেগুলোর উপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা পণ্য রপ্তানিতে জার্মানি প্রথম এবং লিথুয়ানিয়া দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।

আবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ইরান ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র। ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ছিল তিন হাজার ৬১৬টি। পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত ও ইসরায়েলের মতো দেশ এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বছরের পর এতো নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও ইরানের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আমেরিকা বা তার মিত্ররা থামাতে পারেনি। একই অবস্থা কিউবা, মিয়ানমার, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া ও ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রেও।

মোদ্দা কথা কোন নিষেধাজ্ঞাই এসব দেশের অর্থনীতি ধ্বসিয়ে দিতে পারেনি। বরং বিকল্প পথ তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিকল্প পথের নেতৃত্ব দিচ্ছে রাশিয়া ও চীন। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জারি করা ভিসা নীতি নিয়ে আরও সোচ্চার হওয়ার সুযোগ এসেছে বাংলাদেশের। এখন বাংলাদেশ নিজেদের প্রমাণ করার এই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

জঙ্গিবাদ বিষয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ করে দেখিয়েছেন শেখ হাসিনা

নব্বইয়ের দশকের পর থেকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটতে শুরু করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সশস্ত্র জঙ্গিবাদের উত্থানের সর্ববৃহৎ আলামত দৃশ্যমান হয় ২০০৫ সালে জেএমবির ৬১টি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে। এরপর সারা দেশে ছোট-বড় আরও অনেক সশস্ত্র জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ ও নৃশংস ঘটনা ঘটে ২০১৬ সালের ১ জুলাইয়ে গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয়। সেখানে ৫ জঙ্গিসহ ২৯ জনের প্রাণহানি ঘটে।

দুই দশকে এসব হামলার শিকার হয়েছেন খোদ বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশকে জঙ্গিগোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি ঘোষনা দেন জিরো টলারেন্সের। এটা যে কোন মুখের কথা ছিলো না তা বাংলাদেশ বুঝতে শুরু করেছে। একের পর এক জঙ্গি গোষ্ঠীর উত্থান, একের পর এক নৃশংস হামলার পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন জঙ্গিমুক্ত দেশে পরিণত হতে চলেছে।

নানা চড়াই উৎরাইয়ের পর বিশ্বে জঙ্গিবাদ দমনে যে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ তার ক্যাপ্টেন বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দেশব্যাপী জঙ্গিবিরোধী অভিযানে এই সাফল্য অর্জন করেছে। বৈশ্বিক ইনডেক্সে হাই রিস্কের (উচ্চ ঝুঁকি) দেশ থেকে লো রিস্কের (নিম্ন ঝুঁকি) দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) তত্ত্বাবধানে নতুন জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করলেও তা যৌথ বাহিনীর ব্যাপক অভিযানের মুখে অনেকটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

গোবাল টেররিজম ইনডেক্স (জিটিআই)-২০২৩ প্রতিবেদন অনুযায়ী এর সূচকে বাংলাদেশ তিন ধাপ উন্নতি করেছে। অর্থাৎ দেশে সন্ত্রাসবাদ আরও কমেছে, দেশ নিরাপদ হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো করা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি ও ভারতের চেয়েও জঙ্গি দমনে ভালো করেছে বাংলাদেশ। জঙ্গিবাদ পুরাপুরি নির্মূল না হলেও জঙ্গি সংগঠনগুলোর মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তবে এখনও অনলাইনে সক্রিয় রয়েছে বেশকিছু জঙ্গি সংগঠন।

পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্রে জানা গেছে, ২০০১ সাল থেকে ২০২৩ সাল গত ২২ বছরে সারাদেশে জঙ্গিবাদ বিষয়ক প্রায় ২ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৯ হাজারেরও বেশি জঙ্গি। এসব জঙ্গিরা হচ্ছে জেএমবি, নব্য জেএমবি, আনসার আল ইসলাম, হরকত-উল-জিহাদ হুজি, হিযবুত তাহরির, জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়াসহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। বিশেষ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার মধ্যে সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন এবং প্রাসঙ্গিক আইন সংশোধন অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০০৯-২০১৩ সালে, ব্লগার, লেখক, প্রকাশক, হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ পুরোহিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মানবাধিকার কর্মী, ভিন্নমতের ইসলামী মতাদর্শের অনুসারী, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং বিদেশীদের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ দেশে জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জে ফেলেছিল। তবে এখনো পুরনো জঙ্গি সংগঠন জএমবি, আনসার-আল ইসলাম ও হুজিবি সংগঠিত হওয়ার সময়ে অনেক জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়েছে। নব্য জেএমবির সর্বশেষ আমির মেহেদি হাসান জন তুরস্কে বসে সংগঠনটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের মুখে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনগুলো কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

বাংলা ভাইয়ের সন্ত্রাস, হরকাতুল জেহাদের হুমকি ধামকির বিপরীতে বিশুদ্ধ বাংলাদেশ ও জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্স নীতির কারণে। দেশে এখনো পর্যন্ত জেএমবি, শাহাদাত-ই-আল-হিকমা, জেএমজেবি, হিজবুত তাহরির, হুজি-বি, এবিটি, আনসার আল ইসলাম এবং আল্লাহ দল নামে আটটি জঙ্গি সংগঠনকে বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সরকারের কঠোর ভূমিকার কারণে দেশের জঙ্গিবাদ নেটওয়ার্ক ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে।

বলতে দ্বিধা নেই, জঙ্গিবাদ দমনে ২০১৬ সালে গুলশানে হলি আর্টিজানে হামলার ঘটনার আগে জঙ্গি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পুলিশের তেমন দক্ষতা ছিল না। এরপর গঠন করা হয় পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট, ডিএমপির কাউন্টার-টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম, সাইবার ক্রাইম, ইনভেস্টিগেশন সেন্টার এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ইন্টারসেপশন ইউনিট জঙ্গিবাদ দমনে সরাসরি কাজ করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইনে জঙ্গিদের তৎপরতা ঠেকাতেও সতর্ক রয়েছে এসব বাহিনী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার বলেছেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ।’ এ দেশের মানুষ ধর্মীয় উগ্রবাদিতা ও তাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত জঙ্গিবাদকে ঘৃণা করে। শিশুদের জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ থেকে দূরে রেখে একটি আধুনিক ও জ্ঞানভিত্তিক উন্নত জাতি গঠনে অবদান রাখতে হজযাত্রী এবং আলেম-ওলামাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আপনাদের (হজযাত্রীদের) এবং আলেম-ওলামাদের জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি যাতে আমাদের শিশুরা এটি থেকে দূরে থাকতে পারে এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়তে আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রস্তুত হতে পারে। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, যারা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করছে তারা সব ধর্মেই আছে। ‘যদি কেউ মনে করে যে তারা নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে বেহেশতে যাবে, তা কখনোই হবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা বলেননি এবং আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) তা বলেননি।

তিনি এই কথাগুলো বিশ্বাস করেন বলেনই তার সরকারের প্রথম মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) জঙ্গিবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। অপরাধ দমন, অপরাধী শনাক্তকরণ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, মাদকদ্রব্য চোরাচালান রোধ, মানবপাচার রোধ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইজরা জেয়ার এতো আবদার কেন?

রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইজরা জেয়ার আবদার ও বাংলোদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যৌক্তিক অবস্থান। আবদারটি কী ছিলো? আবদার হলো, তিনি বলছেন বৈঠকে তাঁরা রোহিঙ্গা পুনর্বাসনে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জন্য ১১৬ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় দুপুর তিনটার পরে উজরা জেয়ার সঙ্গে বৈঠকের খবর প্রকাশিত হয়। যেখানে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারসংক্রান্ত আন্ডার সেক্রেটারির দুটি প্রধান বিষয়ে আলাপ হয়েছে। একটি হলো রোহিঙ্গা সমস্যা ও আরেকটি হলো আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করা। বৈঠকের ঘন্টা দুয়েক পরে বাংলাদেশের মিডিয়ার খবরে ভেসে আসে যে সংবাদ তাহলো- মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের ওপর মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার ঘোষণা। বুঝতে সমস্যা হয় না, ঘোষিতভাবে এই পদক্ষেপ বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন ভিসা নীতির ধারাবাহিকতারই অংশ। বলা হয়, এই নীতি মূলত প্রযোজ্য হবে গণতান্ত্রিক এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ওপর। এরপরে যে প্রশ্নটি সামনে আসে- তবে কী উজরা জায়ার সঙ্গে বৈঠকে এমন কিছু ঘটেছে যা ভিসানীতি কার্যকরের ঘোষণা ত্বরান্বিত করেছে।

প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনায় বসলে সবার আগে যেটি সামনে আসে তাহলো রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইজরা জেয়ার আবদার ও বাংলোদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যৌক্তিক অবস্থান। আবদারটি কী ছিলো? আবদার হলো, তিনি বলছেন বৈঠকে তাঁরা রোহিঙ্গা পুনর্বাসনে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জন্য ১১৬ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু তিনি পাশাপাশি এও বলছেন, রোহিঙ্গাদের উন্নত জীবিকা নিশ্চিত করতে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির করতে হবে। এবং পাশাপাশি পাদটীকা হিসেবে যুক্ত করছেন যে, রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো শুরু করার আগে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই মার্কিন কর্মকর্তার সঙ্গে জাতিসংঘ সদর দফতরের দ্বিপাক্ষিক কক্ষে ২০ মিনিটের এ বৈঠকে

রোহিঙ্গা সংকট ও নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উজরা জেয়া জানান, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ প্রত্যাবাসনের পরিস্থিতি এখনও প্রস্তুত নয়।

আচ্ছা, উজরা জেয়ার যদি মনে হয়, নিরাপদ প্রত্যাবাসনের পরিস্থিতি প্রস্তুত নয়, সেক্ষেত্রে এককভাবে বাংলাদেশের করণীয় কি? রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা? একটা দেশে বিশেষ পরিস্থিতিতে যে রিফ্যুজি জনগোষ্ঠীকে জায়গা দেওয়া হলো, সাত বছর ধরে তাদের ভালোভাবে টিকে থাকার ব্যবস্থাদি দেখভাল করা হলো, তাদের একার দায়িত্ব সেই জনগোষ্ঠীকে ‘অ্যাবজর্ব’ করে নেওয়া? বাংলাদেশের জন্য সেটা হুমকিরা কিনা, নিরাপত্তাহীনতা আছে কিনা সেসব বিবেচনায় নিবে কে?

জেয়ার সাথে ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমাদের অগ্রাধিকার হচ্ছে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন করা।’

নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বরাবরই বলছেন, যদি প্রত্যাবাসন দীর্ঘায়িত হয় তবে এ অঞ্চল নিরাপত্তা–হুমকির মধ্যে পড়বে। কারণ, রোহিঙ্গারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে হত্যা, আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান ও মাদক ব্যবসা। রোহিঙ্গারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

এর আগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের ফাঁকে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ, কানাডা, গাম্বিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ সদর দপ্তরে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে ‘তারা কি আমাদের ভুলে গেছে?’ শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের এক ইভেন্ট আয়োজন করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একদিকে রোহিঙ্গাদের জন্য আর্থিক সহায়তা কমছে, অন্যদিকে তাদের প্রত্যাবাসনে ধীরগতিতে বাংলাদেশ উদ্বিগ্ন। রোহিঙ্গা সংকটের একটি টেকসই সমাধান নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব বাস্তবায়নের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের নিজ মাতৃভূমি মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বানও জানান তিনি। বাংলাদেশের এই অবস্থানের জন্য কি তাকে চাপে ফেলা যায়? আশ্রয় দিয়ে এতো মানুষের জীবন বাঁচিয়ে বিশ্বমোড়লদের কাছ থেকে এই পরামর্শ কীভাবে মোকাবিলা করবে বাংলাদেশ।

২২ সেপ্টেম্বর জেয়ার সঙ্গে বৈঠকে আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে

বাংলাদেশের মানুষ ভয়কে জয় করতে জানে

যুক্তরাষ্ট্র গত মে মাসে ভিসানীতি আরোপের ঘোষণা দিয়েছিল। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যায় তারা ভিসানীতি ঘোষণার কার্যকারিতার কথা জানালো। এই ভিসানীতি কার্যকারিতার কথা তারা তখন জানালো যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন।
আরেকটু স্পষ্ট করে বললে, নিউ ইয়র্কের স্থানীয় সময় গত শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়ার এক বৈঠকে আবারও বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়।

ওই বৈঠকের পর আজরা জেয়া নিজেই এক্সে (সাবেক টুইটার) সচিত্র একটি পোস্ট দিয়েছেন। এতে তিনি লিখেছেন, ‘রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বাংলাদেশ, কানাডা, গাম্বিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের একটি সাইড ইভেন্টের আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আবারও যুক্ত হতে পেরে সম্মানিতবোধ করছি। আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, অংশীদারত্বের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং ৯ লাখ ৬০ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে উদারতার সঙ্গে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেছি।’

বৈঠকে আজরা জেয়া প্রধানমন্ত্রীকে জানান, তারা রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জন্য ১১৬ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জেয়া রোহিঙ্গাদের উন্নত জীবিকা নিশ্চিত করতে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর জোর দেন।

জবাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু করা উচিত, অন্যথায় এই অঞ্চল নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়বে। কারণ রোহিঙ্গারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে হত্যা, আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান এবং মাদক কারবার। রোহিঙ্গারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কারণ তাদের প্রত্যাবাসন দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং তারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে এবং তারা সেখানে

কোনো ভবিষ্যৎ অনুভব করছে না।

একটা বিষয় খেয়াল করলে বুঝা যাবে, উজারা জেয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর পরই বাংলাদেশের উপর যুক্তরাষ্ট্র তাদের ভিসানীতি কার্যকর করার ঘোষণা দিয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করেছে। তাদের দাবি ছিলো, রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেছেন, তাদেরকে নিজ দেশ ফিরিয়ে নিতে যত তাড়াতাড়ি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত।

এ থেকে বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই যে, রোহিঙ্গাদের কর্মসংসস্থানের প্রস্তাব সরাসরি ফিরিয়ে দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র নাখোশ হয়েছে। এই প্রস্তাব ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আর কী কী প্রস্তাব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছিল তা আমরা জানিনা। মনে হচ্ছে, এমন কিছু প্রস্তাব হয়তো প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছিল যেগুলো তিনি নাকচ করে দিয়েছেন।

এবার আসা যাক বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচন প্রসঙ্গে। বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। অনেকদিন ধরে তারা সেটি বলে আসছে। বাংলাদেশের তরফ থেকেও বার বার জানানো হয়েছে যে, আগামী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হবে। তারপরও তারা ভিসানীতি আরোপ করে সেটি কার্যকর করতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো- নির্বাচন তো এখনও হয়নি। তার আগেই কেন ভিসানীতি আরোপ ও কার্যকর করা হলো?

এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করতেই এসব ভিসানীতি, নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। গণতন্ত্র, অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক ভোট শুধুমাত্র ইস্যু। নিজের দেশেই আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করতে নানান কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। নিজের দেশেই যেখানে বাইডেন প্রশাসন প্রশ্নবিদ্ধ সেখানে অন্যদেশের গণতন্ত্র নিয়ে তাদের এতো মাথা ব্যাথা কেন?

বাংলাদেশেই যে তারা প্রথম ভিসানীতি আরোপ বা নিষেধাজ্ঞা জারি করে তা কিন্তু নয়। সাম্প্রতিক অতীত ঘাটলে দেখা যাবে, যুক্তরাষ্ট্র আরও বহু দেশের সরকারের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদদের উপর একইভাবে ভিসানীতি এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এটা নতুন কিছু

নিয়েছিল। সেই যুদ্ধে সপ্তম নৌবহর পর্যন্ত পাঠিয়েছিল রিচার্ড মিলহাউস নিক্সন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। তাই ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। আর আমাদের সংবাদ মাধ্যমেরও উচিত নিষেধাজ্ঞা বা ভিসানীতির বিষয়টি এতো বড় করে না দেখা। বাংলাদেশের মানুষ ভয়কে জয় করতে জানে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন হাব দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

বছর পাঁচেক আগেও দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষজন ভাবতে পারেননি তাদের জীবনযাত্রার মান আমূল পাল্টে যাবে। গ্রামের পরিবেশ হয়ে উঠবে আধুনিক। আনাচে-কানাচে গড়ে উঠবে ছোটবড় শিল্প কারখানা। দক্ষিণের সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা হয়ে উঠবে পর্যটকদের তীর্থ স্থান। কিংবা দক্ষিণবঙ্গের জনপদ জুড়ে গড়ে উঠবে অত্যাধুনিক যোগাযোগ অবকাঠামো। জলযান লঞ্চের আট-দশ ঘণ্টার ভ্রমণকে ইতি জানিয়ে সহজেই মাত্র চার থেকে পাঁচ ঘণ্টায় তারা পৌঁছে যাবেন রাজধানী ঢাকায়। দিনের কাজ শেষে রাজধানী ছেড়ে আবারও চলে যাবেন গ্রামে।

এক জাদুতেই এতো সব অসম্ভব মুহূর্তেই সম্ভবে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের আত্মমর্যাদার প্রতীক স্বপ্নের পদ্মা সেতু দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে রাতারাতি। এক সময় যে সেতু ছিল দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের কাছে মুধুই স্বপ্ন, সেটি এখন শুধু তাদের ভাগ্যের চাকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নের গতিপথকেই পাল্টে দিয়েছে পদ্মা সেতু। শুধু যে পদ্মা সেতু তা নয়, এই সেতুকে ঘিরে তৈরি হয়েছে করে এক্সপ্রেসওয়ে। একইসঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগযোগ ব্যবস্থারও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে।

স্বাধীনতার পর বরাবরই অবহেলিত ছিলো ধান-নদী-খালের জনপদ বৃহত্তর বরিশাল। শুধু বরিশাল অঞ্চলই নয়, এর সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আরো অনেকগুলো জেলা যোগাযোগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল যোজন যোজন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর পদ্মা সেতু নির্মাণ হলে এসবস জেলার

কোটি মানুষের দীর্ঘদিনের দুঃখ-কষ্ট ও আক্ষেপ দূর হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ওই অঞ্চলে উন্নয়নের পালে হাওয়া লাগতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করেছে বরিশাল বিভাগের বরিশাল, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলার চিত্র। এই ছয় জেলার প্রাণকেন্দ্র বরিশাল শহর হয়ে উঠছে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। পদ্মা সেতু নির্মাণের পর বৃহত্তর বরিশালসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের পথের ক্লান্তি দূর হয়েছে। নৌপথের ৮-১০ ঘণ্টার জার্নি নেমে এসছে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টায়।

দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তারা বলছেন, পদ্মা সেতুর কারণে এবং যোগাযোগ অবকাঠামোর অভাবনীয় উন্নয়ন ঘটছে বরিশাল অঞ্চলে। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে পায়রা বন্দর। এই দুই বড় অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে বরিশাল অঞ্চল দেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক করিডর হিসেবে গড়ে উঠবে। এখন দেশের অর্থনীতির লাইফলাইন বলা হয় ঢাকা- চট্টগ্রাম হাইওয়েকে। অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হাইওয়েও হয়ে উঠবে দেশের অর্থনীতির অন্যতম লাইফলাইন।

পদ্মা সেতু আর পায়রা বন্দরের কারণেই বরিশাল অঞ্চলে ব্যবসা- বাণিজ্য প্রসার ঘটছে দিনে দিনে। আগামী কয়েক বছরে এই অঞ্চলে ব্যাপক হারে গড়ে উঠবে শিল্পকারখানা। দেশের অর্থনীতিতে গতি আনবে এই অঞ্চল। ব্যবসায়ীরা স্বল্প খরচে এবং কম সময়ে বরিশাল অঞ্চল থেকে রাজধানীঢাকাসহ সারাদেশে পণ্য পরিবহন করতে পারবেন। একই সঙ্গে পায়রা বন্দরকে ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে ও কম খরচে ও আমদানি-রফতানি করতে পারবেন। ইতিমধ্যে এই বন্দর দিয়ে আমদানি রফতানি উৎসাহিত হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। এটা দিনে দিনে বাড়তে থাকবে এবং অর্থনীতির গতিও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। বিনিয়োগকারিরাও এখন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দিকে ঝুঁকছেন।

এদিকে শুধু পায়রা বন্দর নয়, মোংলা বন্দরও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখবে। যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটায় এখন মোংলাবন্দর ব্যবহার করা আগের চেয়ে সহজ হবে। ব্যবসায়ীরা বলছেন,পদ্মা সেতুর মাধ্যমে বরিশাল বিভাগ অর্থনীতিতে সরাসরি দুই ধরনের সুবিধা পাচ্ছে। প্রথমত, বরিশাল বিভাগসহ পুরো দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে। এতে ওই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার লাভ করছে। বিনিয়োগ বাড়ছে। দ্বিতীয়ত, কৃষক সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য সরাসরি ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে স্বল্প সময়ের পাঠাতে পারছে। এতে পণ্যের ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে।

গড়ে উঠছে শিল্প কারখানা, পদ্মা সেতু আর পায়রা বন্দরকে কেন্দ্র করে বরিশাল বিভাগের ৬ জেলায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ঘটবে শিল্প বিল্পব। ইতোমধ্যে শিল্পায়নের কাজও শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও শিল্প গ্রুপ দ্রুততার সঙ্গে বরিশাল অঞ্চলে শিল্প কারখানা স্তাপনের জন্য জমি ক্রয় শুরু করেছে। কেউ কেউ প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজও শুরু করেছেন। পায়রা সেতু থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত মহাসড়কের আশপাশে দেশের ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিকরা জমি ক্রয় করেছেন। পায়রা বন্দর এলাকার আশপাশে জমি ক্রয় করেছে মদিনা গ্রুপ ও এমএম বিল্ডার্স নামের প্রতিষ্ঠান।

দক্ষিণের প্রধান সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটাকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে শতাধিক হোটেল- মোটেল। পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটার খাজুরা, গঙ্গামতী, কাউয়ার চর, ভোলা ও পটুয়াখালীর চরাঞ্চল এবং বরিশাল ও এর আশপাশে জমি ক্রয় করেছে সিকদার গ্রুপ, ইউএস বাংলা, সেঞ্চুরি, বসুধা, ওয়েস্টার্নসহ কমপক্ষে ১৫টি বড় বড় শিল্পমালিক। তারা ওই অঞ্চলে নির্মাণ করবে বিভিন্ন ধরনের ভারি শিল্প-কলকারখানা ও বহুতল ভবন। কুয়াকাটায় ১৭ তলা বিশিষ্ট ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণের অপেক্ষায়। বরিশালের বিসিক শিল্পনগরীতে প্রথমবারের মতো পোশাক তৈরির কারখানা, বোতলজাত পানি পরিশোধনাগার ও কমফোর্টারের কারখানা গড়ে উঠেছে।

শুধু বরিশাল অঞ্চল নয়, ভাঙ্গা মোড় থেকে বরিশাল পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে এখন আর কোনো প্লট খালি নেই। সবগুলোই দেশের কোনো না কোনো শিল্প গ্রুপ বা বড় শিল্প উদ্যোক্তারা কিনে নিয়েছেন। গড়ে তুরছেন শিল্প প্রতিষ্ঠান। যে হারে এই অঞ্চলে শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে শুরু করেছে তাতে আগামী এক-দুই বছরের মধ্যে বরিশাল অঞ্চলে বেকারত্বের হার কমে আসবে ১০ থেকে ৩০ ভাগে।

বরিশালকে বলা হয় ‘ধান-নদী-খাল’ এর দেশ। পদ্মা সেতুর কারণে সেই নামের ফল পেতে শুরু করেছেন ওই অঞ্চলের কৃষকরা। বরিশালে ধান, শাকসবজি, নারকেল, সুপারি, পেয়ারা, আমড়া, তরমুজের পাশাপাশি তেজপাতারও চাষ হয়। এতো এতো উৎপাদন হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এতোদিন এসব পণ্য তারা বাজারজাত করতে পারতেন না। পদ্মা সেতু ঘিরে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কারণে এখন এসব পণ্যের বাজারজাত সহজ হয়েছে। এখন অন্যান্য কৃষিপণ্যের পাশাপাশি এ অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে তেজপাতা চাষের মহাপরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে দিন দিন বাড়ছে নারকেল ও সুপারির বাগানও।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্মতিথি উদযাপনে মেহেরপুরে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪ তম জন্ম তিথি উৎযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর নজরুল একাডেমির উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার ২২ সেপ্টেম্বর রাতে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনাতনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল হুদা তার বক্তব্যে বলেন,’কাজী নজরুল ইসলামের বল বীর, বল উন্নত মম শির কবিতাকে যিনি অন্তরে ধারন করেছিলেন তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণে আমি নিজে শুনেছিলাম বল বীর বল উন্নত মম শিরের ভাবার্থ যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ভাষণে বলেছিলেন যারা বিদেশ থেকে এসে দেশ দখল করেছে, যারা হানাদার তাদের কে তাড়াতে হবে।’

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য, কবিতা ও গান নিয়ে বিশদ আলোচনার পাশাপাশি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের রসবোধ নিয়েও আলোচনা করেন। এছাড়াও প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমিতে এসেছেন এটা মেহেরপুর বাসির জন্য অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের।’

মেহেরপুর নজরুল একাডেমীর সভাপতি ড.গাজী রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল হুদা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, বাংলা একাডেমীর পরিচালক ড.আমিনুর রহমান, কথা সাহিত্যিক রফিকুর রশিদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড.বাকী বিল্লাহ বিকুল, অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন আরা

সাথী, মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন।

শেখ হাসিনা সেদিন সীমান্ত খুলে না দিলে কী হতো!

২০১৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বরে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দেখতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেইদিনের তার চোখে মুখে ছিলো এক অন্যরকম মায়া। ভাষাগত দুরত্বের পরেও মানুষকে কীভাবে কাছে টেনে নিতে হয় সেইদিন তা দেখিয়েছিলেন মানবিক প্রধানমন্ত্রী ও মমতাময়ী শেখ হাসিনা। গত ছয় বছর ধরে তার সরকার যেভাবে লক্ষ লক্ষ নারী শিশু রোহিঙ্গাকে আগলে রেখেছেন, বারবার একটা প্রশ্ন সামনে আসে- কী হতো সেদিন, যদি বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দেওয়া না হতো।

রোহিঙ্গা নারীর বয়ানে শোনা যায়- চারপাশে ধোয়া। গুলি। একের পর এক গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যে যেভাবে পেরেছি, পালিয়ে এসেছি। আমরা নিঃস্ব।

এই মানুষগুলো তখন এমন আস্থা খুঁজছিলেন, যারা তাদের আবারও তাড়িয়ে দিবে না। রোহিঙ্গাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমদিন কী বলেছিলেন শেখ হাসিনা? উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের থাকার ব্যবস্থা তখনও পুরোপুরি হয়নি। তিনি বলেন, ‘স্বজন হারানোর বেদনা আমি বুঝি৷ ঘরবাড়ি হারিয়ে যেসব রোহিঙ্গা এখানে এসেছেন, তারা সাময়িক আশ্রয় পাবেন৷ আপনারা যাতে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেন, সে ব্যাপারে চেষ্টা চলছে”

একজন রিফিউজির দুঃখ-কষ্ট তিনি বোঝেন। কারণ, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তিনি এবং তার ছোটবোন শেখ রেহানা রিফিউজি হিসেবে ছয় বছর বিদেশে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী পৃথিবীর অন্যতম অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত একটি জাতিসত্তার নাম। রোহিঙ্গাদের ওপর জাতিগত নিধন কোনো নতুন বিষয় নয়। বিগত চার দশকের বেশি সময় বিষয়টি সাময়িক মনে করা হলেও এখন তা স্থায়ী সমস্যা হিসেবে বিরাট আকার ধারণ করেছে। সেটা

থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সাময়িক সময়ের জন্য আশ্রয় দিচ্ছি আমরা। নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের জন্য এখানে সাময়িকভাবে থাকা-খাওয়া, চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করা হবে। আমরা আছি আর্তমানবতার সেবায়।’

সেই রাতে তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসা সরকার প্রধান তার কর্তব্য মনে করেছিলেন। কিন্তু এই বিশ্ব কি তার দায়িত্ব পালন করেছে ঠিকঠাক? এরপর পার হয়ে গেছে ছয় বছর। রোহিঙ্গাদের ভালো থাকা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের যতো মাথা ব্যাথা, বিশ্বমোড়লদের সেই আন্তরিকতা দৃশ্যমান নয়। ২০১৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশ ধনী দেশ নয়। কিন্তু যদি আমরা ১৬ কোটি জনগণকে খাওয়াতে পারি, তবে আরও ৭ লাখ মানুষকেও খাওয়াতে পারব। আসলেই তিনি তার কথা রেখেছেন। গত ছয় বছর থেকে ১১ লাখ রোহিঙ্গার ভরণপোষণের দায়িত্ব এভাবেই পালন করে যাচ্ছেন তিনি।

রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়্যিপ এর্দোয়ান৷ জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর-এর বিশেষ দূত ও হলিউড তারকা অ্যাঞ্জেলিনা জোলি রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ও সহৃদয় নেতৃত্বদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেন। দেশে বিদেশে সকল মানবিক সরকার ও বিশিষ্টজন শেখ হাসিনার এ উদ্যোগকে এক কথায় সমর্থন যুগিয়েছে। মানবতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়ায় সংবাদ সংস্থা ইন্টার প্রেস সার্ভিস থেকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে জাতিসংঘের সাবেক দুই মহাসচিব কফি আনান ও বুট্রোস ঘালি এবং ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মার্তি আহতিসারি এই সম্মাননা পেয়েছেন।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (ডব্লিউএফপি) ১ মার্চ থেকে রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্যসহায়তা কমিয়ে মাথাপিছু মাসিক বরাদ্দ ১২ ডলার থেকে ১০ ডলার করেছে। পরবর্তীতে ১ জুন থেকে তা ১০ ডলার থেকে কমিয়ে ৮ ডলার করেছে যা হতাশাজনক। রোহিঙ্গারা সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে খাদ্য সংকট বাড়বে এবং ক্যাম্পের নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে ত্রানকর্মীরা। এদিকে, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে এখন চীনের উদ্যোগে মিয়ানমারের নেয়া পাইলট প্রকল্প, পশ্চিমা দেশ ও দাতা সংস্থার সহায়তা হ্রাস, রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আত্তিকরন,